বিবেকানন্দ-সংবাদ আহর্তা নরেন্দ্রনাথ সেন ও ইন্ডিয়ান মিরর

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা টাউন হল কত যে ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী তার ইয়ত্তা নেই। যেমন ১৯০৫ সালে ৭ আগস্টের সেই বিশাল জনসভা। সেদিন কানায় কানায় পূর্ণ সভাগৃহের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আগামী দিন যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করবেন তাঁদের অনেকেই। মঞ্চের সম্মুখে ছিলেন বহু বিশিষ্টজন, সেইসঙ্গে প্রভূত মানুষ যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার। সমগ্র উপস্থিতিকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিল একটি তীব্র ক্ষোভের বাতাবরণ। সবাই সেদিন সমবেত হয়েছিলেন তারই যথোচিত প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক সমাধানসূত্রের সন্ধানে। সভাটির পরিকল্পক ছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার ও সদস্যরা। তাঁরা সেইসময় কখনও নিজেদের কার্যালয়ে অথবা মৈমনসিং-এর মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের প্রাসাদে ঘনঘন সভা করছিলেন। কারণ তার কিছুদিন পূর্বে ১৯ জুলাই ১৯০৫ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারই যথাযথ প্রতিবাদ এবং সেই অভিসন্ধি বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই সভাগুলি হত। বস্তুত এটি ছিল দ্বিতীয় দফা বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্রিটিশ বাসনা। প্রথমবার একাজ তাঁরা করেছিলেন ১৮৭৪ সালে; তখন বিচ্ছিন্ন অংশটিকে পৃথক আসাম রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে তার মধ্যে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা তিনটিকে জুড়ে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী সেইসময় রাজনৈতিক শক্তির অভাবে সেভাবে প্রতিবাদ করা যায়নি। তাছাড়া আসামের মানুষের ইচ্ছার দিকটিও কাজ করেছিল। এরপর ১৯০৩ সালের শেষদিকে আর একবার প্রয়াস নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকার—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলা তিনটিকেও আসাম রাজ্যের সঙ্গে জুড়তে চেয়েছিলেন তাঁরা। চট্টগ্রাম ও বাংলার মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদে সেই পরিকল্পনা রদ হয়েছিল, তবে সরকার সেটি ভোলেননি। লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসেবে কার্যভার গ্রহণের পর নতুন করে এই কাটাছেঁড়া আবার মাথা চাড়া দেয়, যদিও তাঁর ভাবনার মধ্যে অন্য মতলবের ছায়া ছিল। তারই মোকাবিলায় ৭ আগস্ট টাউন হলের সভাটি আহূত

হয়েছিল। তবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য ঠিক কোন পথ গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে নেতৃবর্গের মধ্যে তৎপূর্বে দফায় দফায় প্রভূত আলোচনা হয়েছে, নানা সিদ্ধান্ত হয়েছে—আবার তা বাতিলও হয়েছে। শেষ অবধি একটি সিদ্ধান্তে সবাই সহমত হয়েছেন—'বয়কট'; অর্থাৎ জনজীবনে ব্যবহৃত সমুদয় ব্রিটিশ দ্রব্যাদির ব্যবহার স্বেচ্ছায় বন্ধ করা হবে। তবে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুটি দিক বিশেষ ভাবিয়েছিল নেতৃবর্গকে। কারণ এটি বহাল হলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর, আর উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই। কিন্তু এর ফলে সম্ভবত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের ইংরেজ সুহৃদ এবং ব্রিটেনের সহৃদয় জনসাধারণের সহযোগিতার দিকটি হারাবেন। যাই হোক শেষ অবধি বিশিষ্ট ইংরেজ সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয় যে, যেহেতু 'বয়কট'-এর অস্ত্রটি নেহাতই সাময়িকভাবে প্রয়োগ করা হবে শুধুমাত্র লর্ড কার্জনকে বাগে আনার জন্য, তাই এটির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিকটি সেই মুহূর্তে বিবেচ্য নয়। কিন্তু তখনও একটি দ্বিধা ছিল—টাউন হলের সভায় এত বড় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাবক কে হবেন; অর্থাৎ 'বয়কট'-এর Resolution সভায় কে উত্থাপন করবেন? উত্তরের জন্য আমরা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথার সাহায্য নেব :

''বয়কটের প্রস্তাবটি সভায় পেশ করার দায়িত্ব বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনকে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজের জন্য বাংলার নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর তুল্য মিতাচারী ও স্বদেশপ্রেমী অন্য আর কেউ ছিলেন না। তিনি সেই সময় তাঁর খ্যাতি ও প্রভাবের তুঙ্গে বিরাজ করছেন। তিনি তখন ভারতীয় মালিকানায় বাংলার একমাত্র ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ইন্ডিয়ান মিররের সম্পাদক।''[১]

একথা অনস্বীকার্য, ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধের উদ্বোধন ঘটেছিল বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকালে মানতেই হবে যে, 'বয়কট' অস্ত্রের প্রয়োগ ও তার ফলশ্রুতিই শেষপর্যন্ত নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল পরবর্তী স্বাধীনতার লড়াইয়ে। সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলা যায় নরেন্দ্রনাথ সেনই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে পাঞ্চজন্য ধ্বনি তুলেছিলেন—কলকাতার টাউন হলে, ৭ আগস্ট ১৯০৫। ভগিনী নিবেদিতা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন—সে-যোগাযোগের যেমন সক্রিয় দিক ছিল, সেইসঙ্গে ছিল এক গভীর আত্মিক দিকও। তাই তাঁর সাক্ষ্যের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সাহায্য নেব গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখনীর :

''বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ নেওয়ায় নিবেদিতা খুশি হয়ে লেখেন, 'বয়কট আন্দোলন মেয়ে ও পুরোহিতদের মধ্যেও প্রসারিত হচ্ছে। মানুষ যেভাবে আত্মত্যাগ করছেন, তা অসাধারণ। এমনকী ছোট দোকানদাররাও বিদেশি পণ্যের ভারতীয় ক্রেতাদের আচরণের প্রতিবাদ করছেন।' নিবেদিতা লেখেন, 'অপরিচিত মানুষজনের নির্দিষ্ট ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে আত্মত্যাগের অদৃশ্য কাজ হয়ে চলেছে, তার থেকে অতি সহজেই একটি জাতির সম্ভাবনার দিকটি অনুমান করা যায়। রুশ জনগণের এই ক্ষমতার জোরেই মস্কোয় নেপোলিয়নের অভিযান নির্মূল করা সম্ভব হয়। ফরাসি জনগণের এই ক্ষমতার জোরেই নেপোলিয়নের সেনাদল গঠিত হয়। এই ক্ষমতার জোরেই আমেরিকা স্বাধীনতা পেয়েছে।''[২]

তবে এই অসামান্য ভূমিকার জন্য নয়—নরেন্দ্রনাথ সেন অমরত্বের অধিকারী তারও আগে আর এক শঙ্খবাদনের জন্য। সে আবাহন বিনা ভারতীয় জন-উদ্বোধনের চিত্রই পালটে যেত,

পালটে যেত বহুজনের স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ও বিস্তার। টাউন হলে বয়কট প্রস্তাব উত্থাপনের প্রায় এক যুগ পূর্বে সেই শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ 'ইন্ডিয়ান মিরর' দৈনিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিদেশ থেকে বিবেকানন্দ-সংবাদের জোয়ার এনেছিলেন স্বদেশভূমিতে। তারপর সেই স্রোতোধারা তিনি প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন পরাধীন ক্ষয়িষ্ণু জাতির চেতনার উজ্জীবনে। বিবেকানন্দ-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নরেন্দ্রনাথের এই ভূমিকার জন্য কোনও সাধুবাদই যথেষ্ট নয়। জাতীয় জীবনে তাঁর এই অতুল কীর্তি অবশ্যই যুগে যুগে ফিরে দেখার যোগ্য।

দুই

কলকাতা কলুটোলার রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) সমসাময়িক কালের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গত শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর একটি আড়াইশো পৃষ্ঠার জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'Dewan Ramcomul Sen And His Times'।[৩] এ-ঘটনা নিশ্চিতভাবে খ্যাতকীর্তি মানুষটির প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ। বলা প্রয়োজন, গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়েছেন—সংবাদটির গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) ও নরেন্দ্রনাথ (১৮৪৩-১৯১১) উভয়েই ছিলেন রামকমলের পৌত্র। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে প্যারীমোহন ছিলেন কেশবচন্দ্রের পিতা, এবং হরিমোহন নরেন্দ্রনাথের। রামকমলের এই দুই পৌত্রই স্বীয় কীর্তিতে উজ্জ্বল। কীর্তি ও খ্যাতির পরিধিতে কেশব সেন নিঃসন্দেহে কনিষ্ঠের থেকে এগিয়ে; জীবন তাঁকে দীর্ঘ আয়ু দেয়নি—কিন্তু অমরত্ব দিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ অধুনা প্রায়বিস্মৃত এক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁর কীর্তির অভিঘাত এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দেশকে উজ্জীবিত করেছিল।

নরেন্দ্রনাথের কথায় প্রবেশ করি। তাঁর অপর চার ভাই ছিলেন জয়পুর রাজসরকারের কর্মচারী, তবে নরেন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী। পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখালেখির শুরু প্রায় কৈশোরকালে, এমনকী নামকরা সাপ্তাহিক ইন্ডিয়ান ফিল্ডের মতো কাগজেও তাঁর লেখা ছাপা হত। ১৮৬১ সালে মনোমোহন ঘোষের (১৮৪৪-১৮৯৬) সম্পাদনায় যখন ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা শুরু হল, সেখানেও নরেন্দ্রনাথের রচনাদি প্রকাশিত হতে দেখা গেল। কিন্তু মনোমোহন বেশিদিন মিররের দায়িত্বে ছিলেন না। ১৮৬২ সালে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একযোগে সিভিল সার্ভিস বা আই সি এস পড়তে ইংল্যান্ড চলে যান। এই সময় কিছুদিনের জন্য নরেন্দ্রনাথ মিররের সম্পাদকের দায়িত্ব সামলান; পরে ১৮৬৬ সালে তিনি অ্যাটর্নি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। কিন্তু আইনব্যবসা তাঁকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারেনি। তাই ১৮৭১ সালে মিরর যখন দৈনিকপত্রে পরিবর্তিত হল তখন তিনি এসে আবার যোগ দিলেন—এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হাত থেকে সম্পাদনার দায়িত্বটিও গ্রহণ করলেন। এই সময় থেকেই ইন্ডিয়ান মিররের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের শুরু, বজায় ছিল জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত। পত্রিকার মালিকানা তাঁর হাতে আসে ১৮৮৯ সালে।[৪]

নরেন্দ্রনাথ পেশাদার সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ১৮৯৭-১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Assembly) সদস্য ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত। ফলে অচিরেই তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাজা

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন, জোর দিয়েছেন সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষায়। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিক্ষাপ্রথার গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকারের (১৮৫৫-১৯২১) মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

''শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজনীতি ও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধীয় যত সভা কলিকাতায় আছে, নরেন্দ্রনাথ প্রায় সকলগুলির সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত আছেন। কেবল থিওজফিক্যাল সোসাইটি ইঁহারই নেতৃত্বাধীন আছে। ইনি এত প্রকার কার্যের সহিত সম্বন্ধ রাখেন যে, লোকে আশ্চর্যান্বিত হয় কেমন করিয়া ইনি এই সকল কার্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু এত কাজ সত্ত্বেও মিরর ইঁহার মনোযোগের প্রধান বিষয়। ইঁহার পাঠাভ্যাস, চিন্তাশীলতা ও শারীরিক পরিশ্রম অনেক যুবকেরও আদর্শস্থানীয়। চরিত্র-নির্মলতায়, দেশানুরাগে, রাজভক্তিতে, পরোপকারিতায় ইনি বঙ্গীয় সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।''[৫]

জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও সমাজসংস্কারের দিকটির প্রতি ইন্ডিয়ান মিররের সম্পাদকের অধিক আগ্রহ ছিল। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্সের একটি সভায় তিনি সভাপতির বক্তব্যে জানিয়েছিলেন : ''আমরা যতই জাতি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চাই না কেন, আমাদের সামাজিক কাঠামোর ভিতরের গলদের কারণে আমাদের প্রয়াস সর্বদাই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং আপনারা লক্ষ করবেন যে রাজনৈতিক সংস্কার অপেক্ষা সামাজিক সংস্কার আমাদের কাছে অনেক বেশি আশু গুরুত্বের দাবিদার।''[৬]

পাশাপাশি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথের প্রথমাবধি যোগাযোগ। ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যখন মাদ্রাজে মায়লাপুরে রঘুনাথ রেড্ডির বাড়িতে থিওজফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখানে উপস্থিত সতেরো জন থিওজফিস্ট সদস্যের মধ্যে তিনিও ছিলেন। বস্তুত এই সতেরো জনই আবার ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই কর্মকাণ্ডের ভূমিষ্ঠলগ্ন থেকে যোগাযোগের কথা আমরা জেনেছি। সি পি রামস্বামী আয়ার রচিত অ্যানি বেসান্তের জীবনীগ্রন্থে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যচেতনার উদ্বোধক হিসেবে বাংলার দুজন সাংবাদিকের নাম উল্লিখিত হয়েছে—বেঙ্গলী পত্রিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইন্ডিয়ান মিররের নরেন্দ্রনাথ সেন।[৭]

অন্যদিকে দেখি প্রথম পাশ্চাত্য সফর শেষে স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর প্রামাণ্য ইংরেজি জীবনী লিখছে : ''স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়... কারণ সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্‌গ্রীব হয়েছিল তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে। লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃপ্রতিম স্বদেশবাসী অধীর আগ্রহে তাঁর দেশে ফেরার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিগত তিন বছরের বেশি সময় ধরে ভারতের মানুষ জেনেছিল কী প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্মের অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে উপস্থাপন করছিলেন।''[৮] পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সাফল্যের কাহিনির সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচিত করার কাজটি মূলত ঘটেছিল সমসাময়িক ভারতীয় পত্রপত্রিকাদির মাধ্যমে। অস্বীকারের উপায় নেই, এই কাজে সর্বোত্তম ভূমিকা নিয়েছিল যে-দৈনিকপত্রটি তার নাম ইন্ডিয়ান মিরর—তার সম্পাদককে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। তাঁর এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রধানত দুটি কাজ করেছিলেন। একদিকে তিনি বিবেকানন্দ-ইতিহাসকে পুষ্ট করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, সুবিচার করেছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিও—অন্যথা এই উপমহাদেশের এক অতীব

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দিক্‌পরিবর্তনের চিত্র বহুলাংশে অধরা থেকে যেত, অজানা থেকে যেত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী শক্তির হদিশ। আজকে নরেন্দ্রনাথের সেই ভূমিকার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে দেখতে চেষ্টা করব। শুরু করব ইন্ডিয়ান মিররের জন্মকথা দিয়ে।

তিন

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫)। তাঁর 'লাইফ অ্যান্ড টিচিংস অব কেশব চন্দ্র সেন' গ্রন্থে ইন্ডিয়ান মিররের শুরুর কথা আছে : কেশব সেন একটি ইংরেজি সংবাদপত্র শুরু করার গুরুত্বের দিকটি অনুভব করেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজকে শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রভাবিত করতে—তাই ১৮৬১ সালে বন্ধু ও সুহৃদদের নিয়ে তিনি পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে ইন্ডিয়ান মিরর শুরু করেন। এই কাজে মনোমোহন ঘোষের ছিল সর্বোচ্চ ভূমিকা। তিনি এবং কেশব সেন মিলে ক্যাপ্টেন পামার নামে এক দরিদ্র সৈনিকের সাহায্য নিয়েছিলেন, যিনি সংবাদপত্রের উপযোগী ইংরেজি রচনায় খুবই চৌকশ ছিলেন। সেইসময় দেশীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত স্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্র বলতে কলকাতায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাড়া আর কিছু ছিল না। ফলে খুব একটা প্রতিযোগিতা না থাকায় মিরর প্রথম থেকেই সাফল্যের সঙ্গে শুরু হয়েছিল।[৯]

কিন্তু মিররের উদ্ভবের অন্য একটি দিকও ছিল। সেটির কথা বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব সেনের ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি লিখছেন :

''... পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে দুই নেতা যৌথভাবে শুরু করলেন ইন্ডিয়ান মিরর, যেটি দীর্ঘদিন যাবৎ কেশব সেন গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে পরিচিত—এবং পরে রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের হাতে চলে যায়... বর্তমানে সেটি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা।... গোড়ায় দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার জন্য অর্থ দিয়েছিলেন... তত্ত্ববোধিনী যেমন ছিল ব্রাহ্মসমাজের বাংলা মুখপত্র, তেমনই ইন্ডিয়ান মিরর হয়ে উঠেছিল ইংরেজি মুখপত্র। পরিকল্পনাটি ছিল শ্রীসেনের, কিন্তু প্রাথমিক রসদ জুগিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।...''[১০]

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই রচনা প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিরর প্রথমে অবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাছাড়া নরেন্দ্রনাথ সেনও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার দিকটি আমরা দেখেছি। সময়ের অগ্রগতিতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতদ্বৈধতার শুরু, ফলে বিভাজন[১১] অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের স্রোত স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি মুখপত্রটির উপরও এসে পড়েছিল—চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল তারও। সংঘাতের শুরু ১৮৬৫ সালে বাৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পরে। যুযুধান দুটি গোষ্ঠী ক্রমেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে পাকাপাকি বিভাজনের পরিস্থিতির উদ্ভব আরও কিছু পরে। মিররের ওপর এই পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবের কথা বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী : ''এই সময় থেকে প্রতি মাসেই বিবাদী দুটি পক্ষের মধ্যে ক্রমেই তিক্ততা বাড়তে থাকে। জুলাই মাস নাগাদ শুরু হয় ইন্ডিয়ান মিরর নিয়ে লড়াই...।'' (তদেব ১৬৩) শেষপর্যন্ত ঘটনা কোন দিকে গড়ায় তা জানাতে গিয়ে একই গ্রন্থে ১৫ জুলাই ১৮৬৫ ইন্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত কেশব সেনের একটি রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে নির্বাচিত অংশ পেশ করব :

''অতএব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইদানীংকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই... [সমাজের]

অছি-পরিষদ ইন্ডিয়ান মিররকে মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেটিকে স্বয়ং-নির্ভরতার দিকে ঠেলে দিয়াছেন... সেই দুর্ভাগ্যজনক দিন থেকেই মিরর নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে চলেছে এবং বিশেষত উল্লেখ্য যে, সে অকুতোভয়ে নিজস্ব সৎ ও সাহসী ভাব অব্যাহত রেখেই চলেছে।" (তদেব ১৬৩)

প্রতাপ মজুমদারের কাছ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেন যখন মিররের দায়িত্ব নেন সেইসময় কেশব সেনের অনুজ বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মিররের কাজে সহযোগিতা করতেন। পরে ধর্মীয় প্রসঙ্গাদি কেন্দ্রিক মিররের একটি বিশেষ রবিবাসরীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু হয়, সেটির ভার পান এই কৃষ্ণবিহারী।[১২] উল্লেখ্য, ১৮৮২ সালে কৃষ্ণবিহারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'সারস্বত সমাজ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১৩]

স্বাভাবিক কারণেই কেশব সেনের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের উপর ছিল। নবীন মিরর যখন কেশব সেনের ধর্মীয় চিন্তাদি ও ভাব বহন করেছে, নরেন্দ্রনাথ তার কান্ডারি হিসেবে কাজ করেছেন। এ-ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় চিন্তাদির সঙ্গে তিনি প্রায় আকৈশোর ঘনিষ্ঠ। অপরদিকে ভারতবর্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটির অঙ্কুরোদ্গমের সময় থেকেই তিনি সেই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এসব সত্ত্বেও তিনি চিরকাল একজন উদারমনা হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন, চিরকাল তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেছেন। এই কারণেই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যখন হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার জয়ধ্বনিতে বিবেকানন্দ-কণ্ঠ নিনাদিত হল—নিবেদিতার ভাষায়[১৪] বললে হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতেও বটে—তখন সেই দূরাগত ধ্বনির অন্তর্গত শাশ্বত বাণীরূপটিকে চিনে নিতে নরেন্দ্রনাথের ভুল হয়নি। তাই সেই শুভমুহূর্ত থেকেই তাঁর মধ্যে আর দ্বিধার কোনও স্থান ছিল না—তাই ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথ, থিওজফিস্ট নরেন্দ্রনাথ নিজেকে অভ্যস্ত সত্তার ঊর্ধ্বে উত্থিত করে বিবেকানন্দ-বাণী ও কীর্তির আবাহনে শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে তাঁর এই কীর্তির কোনও তুলনা নেই। তাঁর দেহান্তের পর মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার নভেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় অবিচুয়ারি নোটে উল্লেখ ছিল : ''বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের... হৃদয় ছিল দৃঢ়, দৃষ্টিভঙ্গি উদার। মহৎ দেশপ্রেম, সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে সু-উচ্চ ধারণা, বর্ণ ও ধর্মের কৃত্রিম ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা, সারাজীবনব্যাপী সাংবাদিকতায় উচ্চ আদর্শের প্রতিপালন, এবং সর্ববিষয়ের বিচারে বদান্যতার অভ্যাস—এইসব গুণাবলির জন্য শাসকগোষ্ঠী এবং জনসাধারণ উভয়ের কাছেই তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন।"[১৫]

চার

কলকাতায় বিবেকানন্দ-সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় স্টেটসম্যান পত্রিকায়। তার আগে সেটি হয়েছিল বোম্বাইয়ে। একই সংবাদ মিরর প্রকাশ করে স্টেটসম্যানের দুদিন পরে—১১ নভেম্বর ১৮৯৩। সংবাদটির সূত্র ছিল বস্টন ইভনিং ট্র্যানস্ক্রিপ্ট পত্রিকায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ প্রকাশিত ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তার উপর লিখিত একটি দীর্ঘ রিপোর্ট। প্রভূত প্রশংসার পাশাপাশি এই সংবাদের মধ্যেই উল্লেখ ছিল যে বিবেকানন্দ কলকাতা হাইকোর্টের এক প্রয়াত অ্যাটর্নির পুত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, এবং দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। এই সংবাদটির সূত্রেই কলকাতার মানুষের আগ্রহের শুরু। এরপর স্টেটসম্যান বেশ কিছুদিন এ-বিষয়ে আর কোনও আগ্রহ দেখায়নি, কিন্তু সে-অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়ান মিরর। দেখা যায় যে স্বামীজীর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও

তাঁর প্রতি পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যমের বাঁধভাঙা আগ্রহের কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ক্রমেই বিবেকানন্দ-সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সংবাদাদি ছিল প্রধানত দু-ধরনের। প্রথমত বিভিন্ন বিদেশি সংবাদপত্র থেকে উল্লেখযোগ্য খবরাখবর আহরণ করে সেগুলির পুনঃপ্রকাশ; দ্বিতীয়ত ভারতীয় পত্রিকাদির বিবেকানন্দ-কেন্দ্রিক নিজস্ব সংবাদাদি, সম্পাদকীয় এবং পাঠককুলের চিঠিপত্র। সবাই বুঝেছিলেন যে দেশের আপামর মানুষ এ-ব্যাপারে আগ্রহী—তবু প্রকাশনার ধারাবাহিকতা, পরিমাপ এবং খবরাখবরের মূল্যায়নে নরেন্দ্রনাথ সেনের মিরর নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে উল্লেখের যোগ্য। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অভূতপূর্ব সাফল্যের পর স্বদেশে বিবেকানন্দ-সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন : ''কলকাতার দেশি সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যে-কাজ সবচেয়ে বেশি করেছে বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ ইন্ডিয়ান মিরর। বিবেকানন্দের বিষয়ে রচনার ব্যাপারে সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের ছিল inspired ভূমিকা। তিনি একবার বলেছিলেন, 'বর্তমানে যেসব ঘটনা ঘটছে তা ঔপন্যাসিকের উজ্জ্বল কল্পনার সৃষ্টি গল্পকাহিনির বিস্ময়করতাকেও হারিয়ে দেয়। অবাক হয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, আমরা কি স্বপ্নজগতে আছি? নচেৎ কীভাবে স্বামী বিবেকানন্দের অত্যদ্ভুত সাফল্যের ব্যাখ্যা করব?' ''[১৬]

নরেন্দ্রনাথ সেনের এহেন ভূমিকার কথা স্বামীজীর অজানা ছিল না। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে ইন্ডিয়ান মিরর অথবা সেখান থেকে সংগৃহীত সংবাদাদির ব্যাপারে বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯৪ সালের গোড়ার দিকে অনাগারিক ধর্মপালকে লিখিত চিঠিতে স্বামীজীর এই উল্লেখটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : '' 'ইন্ডিয়ান মিররের' মহানুভব সম্পাদক মহাশয় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করে আসছেন—সেজন্য তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবে।''[১৭] অন্য একটি ব্যাপারে মিররের প্রতি স্বামীজীর নির্ভরতার দিকটি জানা যায় তাঁর ক্ষিপ্রলিপিকার জোসিয়া গুডউইনের একটি চিঠিতে। ১৮৯৬ সালের ১৪ নভেম্বর গুডউইন শ্রীমতী সারা বুলকে জানিয়েছিলেন : ''ভারতবর্ষে বন্যার দিকটি স্বামীজী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ রাখছেন। এই বিষয়ে ত্রাণের সহায়তায় তিনি ইন্ডিয়ান মিররের কাছে টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।'' আমরা জানি প্রথম পাশ্চাত্য সফর শেষে কলকাতায় ফিরেই তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের সহায়তায় বিপুল ত্রাণ ও সেবাকার্যের সূচনা করেন। সে-গৌরবময় কাহিনি অন্যত্র বলেছি।[১৮] সংবাদ-প্রকাশের পাশাপাশি বিবেকানন্দ-বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান ও ঘটনাদিতেও নরেন্দ্রনাথ সেনকে আমরা সামনের সারিতে দেখি; তাঁর ওপর বিবেকানন্দের প্রভাবের অভ্রান্ত চিহ্ন হিসেবে যাকে বিবেচনা করা যায়। তাঁর বিপুল কীর্তির হদিশ দেওয়া এই রচনার উদ্দেশ্য নয়, তবে কিছু দৃষ্টান্তমূলক দিক আলোচনা করতে পারি।

স্বামীজীর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু সম্পাদকীয় মিররে প্রকাশিত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ১৮৯৪-এর ৬ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয় দিয়ে—'India in the Parliament of Religions Chicago'। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে : ''ধর্মমহাসভায় আপামর দর্শকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসীর বেশে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই মানুষকে জয় করে নিয়েছেন। যখন তিনি কথা বলতে আরম্ভ করেন, তাঁর শরীরের খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন আর একজন মানুষ, আর তখনই তাঁর শক্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়—সমগ্র শ্রোতৃবৃন্দ তীব্র আগ্রহ নিয়ে বৈদিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনতে থাকেন।''

ধর্মমহাসভা পরিসমাপ্তির সংবাদ ভারতে পৌঁছনোর পর ডিসেম্বরের ১২ তারিখ মিররে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, সেখানেও একইভাবে ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অনন্য উপস্থিতির দিকটি তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সাফল্য সাধারণত একা আসে না, সে প্রায়শই সঙ্গে নিয়ে আসে অখুশি মানুষের ক্ষোভ ও নিন্দা, তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং বহুক্ষেত্রে অসূয়াও। সাফল্যের পরিমাপ যত বেশি, বিরুদ্ধাচরণও প্রায় সেই অনুপাতেই হয়। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সবচেয়ে দুঃখের যে এই বিরোধিতা মূলত এসেছিল তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকেই। তাঁরা তাঁকে আক্রমণ শুরু করেন যখন তিনি বিদেশের মাটিতে—চকিত-অর্জিত সাফল্য আর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার কথা ছেড়ে দিলে সেখানে তিনি তখন প্রায় অসহায় একক সন্ন্যাসী। ঘটনাটির কিছুটা আন্দাজ পাওয়ার জন্য দুটি চিঠি থেকে সংক্ষিপ্ত অংশ তুলে ধরব। প্রথম চিঠিটিতে ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখছেন, ''[প্রতাপচন্দ্র] মজুমদার ধর্মমহাসভার মিশনারিদের কাছে এই বলে আমার নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে যে আমি নাকি দেশের একজন নগণ্য লোক, একজন ঠগ এবং জোচ্চোর। আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ যে আমি এখানে পরিচয় ভাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী সেজেছি। আমার বিরুদ্ধে বহু মানুষের মন বিষিয়ে দিয়ে সে এ ব্যাপারে সফলও হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ব্যারোজের মন সে এতটাই বিষিয়ে দিয়েছে যে তিনি আর এখন আমার সঙ্গে ভালভাবে কথাই বলেন না।''[১৯] স্বামীজী দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিলেন মেরি হেলকে, ১৮ মার্চ ১৮৯৪। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ : ''[প্রতাপচন্দ্র] মজুমদার কলকাতায় ফিরে গেছে, আর গিয়েই সে প্রচার করছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বসে দুনিয়ার সবরকম পাপকাজ করছে—বিশেষত নিকৃষ্টতম চারিত্রিক ভ্রষ্টাচার।... সে সেখানে রটাচ্ছে যে আমেরিকান নারীদের সঙ্গে আমি চরম অপবিত্র জীবন কাটাচ্ছি।''

প্রতাপ মজুমদার আমেরিকায় ও কলকাতায় স্বামীজীর নামে শুধু বদনাম রটিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে একত্র হয়ে নববিধান গোষ্ঠীর পত্রিকা ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার-এ স্বামীজীর বিরুদ্ধে রচনাদিও প্রকাশ করেছিলেন। সব মিলিয়ে স্বামীজীর অবস্থার একটি বর্ণনা দিয়েছেন গবেষিকা মেরি লুইস বার্ক :

''...ধর্মমহাসভা শুরুর দিন থেকেই স্বামীজীর খ্রিস্টান ও হিন্দু উভয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধচারীরা ক্রমাগত তাঁর চারিত্রিক ও কর্মোদ্যোগের দুটি দিকই আমেরিকানদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অপপ্রচার চালিয়ে গেছে। (বিশেষত) এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বামীজীর সমর্থনে একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ করেনি; তাদের এই নীরবতা অজ্ঞতাবশত স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত কুৎসাদিকে সমর্থন করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এপ্রিল (১৮৯৪) মাস নাগাদ অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।''[২০]

এই পরিস্থিতির সুরাহার উদ্দেশ্যে ৯ এপ্রিল ১৮৯৪ স্বামীজী মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠি দেন। তিনি সেখানে প্রতাপ মজুমদারের কীর্তি ও আমেরিকায় গোঁড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁর বিরোধিতার কথা জানান। সেই সঙ্গে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর সমর্থনে মাদ্রাজে একটি বৃহৎ জনসভা করার নির্দেশ দেন এবং জানান, সেই সভায় যেন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে—মাদ্রাজের হিন্দু সম্প্রদায়, যাঁরা তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন, তাঁরা আমেরিকায় স্বামীজীর হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্বে সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট; এবং তৎপরে সেই প্রস্তাবের অনুলিপি যেন আমেরিকার 'শিকাগো হেরাল্ড', 'শিকাগো

ইন্টারওশান', এবং 'নিউইয়র্ক সান' পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীজী একই চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে কলকাতাতেও একই ধরনের সভা করার জন্য কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাও জানিয়ে দেন।[২১] স্বামীজীর প্রচারকার্য এবং তাঁর প্রতি আমেরিকার মানুষের প্রশংসাসূচক সহযোগী আচরণ, উভয়ের স্বীকৃতিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'থ্যাংকস্-গিভিং মিটিং' বা ধন্যবাদ-সভার এই ছিল প্রাক্-ইতিহাস। আশ্চর্যের যে, স্বামীজী আলাসিঙ্গা পেরুমলকে আমেরিকা থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন এপ্রিল মাসে ৯ তারিখ, অথচ ঠিক তার পরের দিন, অর্থাৎ ১০ তারিখ ইন্ডিয়ান মিররে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল :

''আমাদের মতে আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের কাজে স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় সাফল্যের জন্য এবং সেইসঙ্গে ধর্মমহাসভার সংগঠকদের—যাঁদের সাহায্য ছাড়া স্বামীজীর পক্ষে আমেরিকায় দাঁড়িয়ে একাজ করা শক্ত ছিল—উভয়কেই ধন্যবাদজ্ঞাপন হিন্দুদের কাছে একটি কৃতজ্ঞতাসূচক কর্তব্য। আমরা আশা করি দেশব্যাপী আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গ এই প্রয়াসে ব্রতী হবেন। বিবেকানন্দ এখন আমেরিকায় রয়েছেন, তাই এই ধন্যবাদপত্র অবিলম্বে তাঁর কাছে পাঠানো উচিত। আমাদের আমেরিকান বন্ধুদেরও অবশ্যই জানানো দরকার যে তাঁরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতাকে যে-সহায়তা করেছেন সেটি স্বীকার না করার মতো অকৃতজ্ঞও আমরা নই।''

মাদ্রাজেই প্রথম ধন্যবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সংবাদ মিররে প্রকাশিত হয় মে মাসের প্রথম দিন। পরে সভার সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী ও আমেরিকায় প্রেরিত ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্রও মিররে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে অনুষ্ঠিত অন্যান্য ধন্যবাদ-সভার সংবাদ, যথা : কুম্ভকোণমে (২২ আগস্ট), ব্যাঙ্গালোরে (২৬ আগস্ট) এবং রাজস্থানের খেতড়ি-তে (৪ মার্চ)। প্রত্যেকটি সভার বিশদ সংবাদ মিরর প্রকাশ করেছিল। পরে যখন মাদ্রাজ সভার ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্রটি স্বামীজীর হাতে পৌঁছয়, তিনি তাঁর একটি অসামান্য প্রত্যুত্তর পাঠান মাদ্রাজে। সেটিরও সম্পূর্ণ অংশ মিররে প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে মাদ্রাজ ধন্যবাদ-সভার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, কারণ মাদ্রাজ থেকেই স্বামীজীর যাত্রার উদ্যোগ ও আয়োজনের বিষয়টি সকলেই অবহিত ছিলেন। তাছাড়া এই সভা হয়েছিল সর্বাগ্রে। এই সভার চিঠিও তিনি পান প্রথম, যদিও দুর্ভাগ্য হেতু সেটি তাঁর কছে পৌঁছতে অযথা দেরি হয়েছিল। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। ভারতের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত ধন্যবাদ-সভাগুলিরও গুরুত্ব ছিল নিশ্চিত। কিন্তু সব ছাপিয়ে গিয়েছিল কলকাতার ধন্যবাদ-সভা—সেটি হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, কলকাতা টাউন হলে। এই সভার প্রভাবই সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত হয়েছিল; এবং তার জন্য কৃতিত্বের সিংহভাগ প্রাপ্য নরেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর ইন্ডিয়ান মিররের। আজও এই দৈনিকের অতীতপৃষ্ঠায় নজর দিলে এই দাবির যথার্থতা অনুভব করা যায়। তবে টাউন হল সভার আগে কলকাতায় আর একটি ধন্যবাদ-সভা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের উদ্যোগে সেই সভাটি হয়েছিল বাগবাজারে কিরণচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। এই সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবসহ স্বামীজীকে লিখিত দীর্ঘ পত্রটি মিররে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

টাউন হল মিটিং-এর জন্য ৩১ আগস্ট মিররে একটি সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ : ''সমগ্র দেশের হিন্দুসমাজ স্বামীজীর কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বার্তা মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোরে সর্বসমর্থিত হয়েছে, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকেও স্বামীজী ও আমেরিকার অধিবাসীদের প্রতি ধন্যবাদ-প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় টাউন

হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।" জনসাধারণের অবগতির জন্য অনুষ্ঠানের দিন সভার একটি বিজ্ঞপ্তি মিররে প্রকাশিত হয়। তবে সভার পরের দিন সম্পাদকীয়তে নরেন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন সেটি ছিল ভবিষ্যদ্‌বাণীর তুল্য :

''গত সন্ধ্যায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিন্দুসমাজের সভাটি সেখানে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক শ্রোতাদের প্রত্যেককেই একটি হৃদয়গ্রাহী প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিয়েছে। সমগ্র শ্রোতৃকুলের মধ্যে অধুনাকালের নানা বর্ণ ও উপবর্ণে বিভক্ত হিন্দুসমাজ দৃশ্যত একটিই সত্তায় মিশে গিয়েছিল—বক্তার পর বক্তা উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, বক্তব্য শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন নিজের আসনে; (মনে হচ্ছিল) সবাই যেন এক অভিন্ন অনুভূতি আর আগ্রহের দোলায় আলোড়িত, সম্মিলিত করতালির ধ্বনি আর তীব্র আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে সমগ্র সভার কার্যাদি অতিবাহিত হয়েছিল। (এই) সবকিছুর মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছিল হিন্দুজাতির শিরা-উপশিরায় জীবন আবার যেন স্পন্দিত হল এক সবল-শক্তিতে।"

মানতেই হবে—অজান্তে, অনভিপ্রেতে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই স্বদেশে তাঁর এই অভিনব অভিষেক ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার রাজপথে স্বামীজীর রথচক্রের ধ্বনি উঠতে তখনও প্রায় বছর আড়াই মতো বাকি, কিন্তু সেদিন টাউন হলের সভায় তাঁর প্রায়-প্রত্যক্ষ মহিমা সবাই অনুভব করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেনের কলমে সেই ছবিই দেখলাম উদ্ধৃত সম্পাদকীয়ের মধ্যে। এই একই রচনায় মিররের সম্পাদক স্বামীজীর অতুলনীয়তার দিকটিও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন :

''স্বামী বিবেকানন্দের আগেও অন্য অনেক হিন্দু আমেরিকায় গেছেন, তাঁরাও সেখানে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছেন—শ্রোতাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোযোগও অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি কোনরকম অসম্মান প্রদর্শন না করেও একথা বলা যায় যে, তাঁরা কেউই বিবেকানন্দের মতো করে বলেননি। তাঁরা ছিলেন বিশেষ কোনও ধর্মমতের প্রতিনিধি, তাঁদের চিন্তাধারা ও বক্তব্য নিজস্ব ধ্যানধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ আমেরিকার মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমগ্র হিন্দুজাতির স্বীকৃত বার্তাবহ হিসেবে—এবং তিনি তাদের সবার হয়েই কথা বলেছিলেন—নিজের জন্য অথবা কোনও গোঁড়া মতবাদের প্রতিনিধিসুলভ স্বতঃগৃহীত অধিকারবলে নয়; শুধুমাত্র আধুনিক হিন্দুদের হয়েই তিনি কথা বলেননি, বরং সেইসঙ্গে অতীতের মহান ঋষি, নীতি-নিয়ামক, এবং সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের প্রফেট বা ধর্মপ্রবর্তকদের পক্ষেও অনেক বেশি করে বলেছেন।"

কলকাতার ধন্যবাদ-সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়। স্বামীজীর প্রতি উদ্দিষ্ট ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় পেশ করেন নরেন্দ্রনাথ সেন; ধর্মমহাসভার সংগঠক ও আমেরিকার নাগরিকদের জন্য প্রস্তাবটি পেশ করেন 'ইন্ডিয়ান নেশন' সাপ্তাহিকের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। স্বাভাবিকভাবেই মিররে এই সভা ও তার কার্যাবলির বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

পাঁচ

টাউন হলের সভার সাফল্য সত্ত্বেও শহরে অখুশি মানুষের মতামত প্রকাশ বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি বলেই নরেন্দ্রনাথ সেনকে আমরা প্রতিবাদ করতেও দেখি। যেমন ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪ মিরর লিখছে : ''আমরা স্বীকার করি, আমরা এখনও সম্যক বুঝতে পারছি না—কেন আমাদের সমসাময়িক 'ইন্ডিয়ান মেসেনজার' পত্রিকা সুযোগ পেলেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমেরিকায় তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতি বিষাক্ত তীর বর্ষণ করছে... ইন্ডিয়ান মেসেনজার উপনিষদ ও ভগবদ্‌গীতার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদির প্রতি সর্বদাই অকপট শ্রদ্ধাই

জানিয়ে এসেছে; বিবেকানন্দ পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের সভাগুলিতে কীসের ব্যাখ্যা করছেন, অথবা বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম-কেন্দ্রিক সভাকক্ষ এবং চার্চ বা চ্যাপেলে কীসেরই বা প্রচার করছেন—গীতা ও বেদান্তের দর্শন ব্যতীত অন্য তো কিছুই নয়।... আমেরিকার মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের উচ্চভাবগুলি প্রচারের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ একটি অতুলনীয় দেশপ্রেমিকের কাজ করছেন—যার জাতীয় গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর এধরনের ব্যাখ্যা ও প্রচার সভ্যজগতের মাপকাঠিতে ইতিমধ্যেই হিন্দুজাতিকে উচ্চাসনে বসিয়েছে। একমাত্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি অথবা সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাবই কোনও হিন্দুকে, তা সে পৌত্তলিক অথবা ব্রাহ্ম যাই হোক না কেন, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের এই মহান কর্মকাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাবশ্যক অভিযোগে প্ররোচিত করতে পারে।"

এমন ভূমিকাতেও নরেন্দ্রনাথ সেনকে আমরা পেয়েছি যেখানে তিনি শুধু দূর থেকে সম্পাদকের সাবধানী ভূমিকা পালন না করে প্রয়োজনীয় প্রতিবাদ জানিয়েছেন, পাঠকের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেছেন। একাজ করতে গিয়ে সত্যের খাতিরে যখন নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান বা বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে আসার প্রয়োজন হয়েছে—তখনও দ্বিধা করেননি। প্রতাপ মজুমদার বা 'ইন্ডিয়ান মেসেনজার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাঁর পূর্বপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কারণে যখন অযথা স্বামীজীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তখন নরেন্দ্রনাথের ভূমিকার একটি চিত্র আমরা এইমাত্র দেখলাম। তবে এর চেয়েও বেশি এক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ইন্ডিয়ান মিররের সম্পাদককে। সে-সমস্যার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন স্বামীজী স্বয়ং—বস্তুত তাঁরই একটি বক্তৃতা : 'মাই প্ল্যান অব ক্যাম্‌পেন'। প্রথম পাশ্চাত্যসফর শেষে মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ তিনি এই বক্তৃতা করেছিলেন। অসামান্য এই ভাষণের প্রায় শুরুতেই তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেন। মনে রাখতে হবে, মাদ্রাজ সেই সময় থিওজফিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। দেশের অন্যান্য আরও নানা স্থানে, বিশেষত শহরাঞ্চলে, সেইসময় থিওজফিক্যাল সোসাইটির অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট। এই রচনায় আমরা আগে দেখেছি নরেন্দ্রনাথ সেন নিজেও এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। স্বামীজী নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই অভিযোগ উত্থাপনের আগেই জানিয়েছিলেন যে তাঁর বক্তব্যের কী ফল হবে সে ব্যাপারে তিনি চিন্তিত নন। বলেছিলেন, তিনি সেই একই সন্ন্যাসী যিনি প্রায় বছর চারেক আগে একটি লাঠি আর কমণ্ডলু নিয়ে মাদ্রাজ শহরে প্রবেশ করেছিলেন—সেই অতীতদিনের মতোই তখনও তাঁর সামনে একই উন্মুক্ত বিপুল বিশ্ব। তারপর স্বামীজী তুলে ধরেছিলেন বিদেশের মাটিতে তাঁর সুনাম ও কাজকর্মের প্রতি থিওজফিক্যাল সোসাইটির ধারাবাহিক বিরোধিতার কথা। জানিয়েছিলেন সেই আক্রমণের ফলে বিদেশে একক সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁকে কী তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বলেছিলেন সেখানে তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু সেদিন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সেসব ঘটনার কথা বলবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তৃতার দ্বিবিধ ফল হয়েছিল। স্বামীজীর অনুগামী, গুণমুগ্ধ এবং সাধারণ মানুষ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছিলেন, স্বামীজীর প্রতি এই অন্যায় ও তার পিছনে থিওজফিক্যাল সোসাইটির এই ভূমিকায় তাঁরা ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে থিওজফিক্যাল আন্দোলনের অনুগামী বা সমর্থক গোষ্ঠীর মানুষজন নানাভাবে বিরোধিতা ও প্রতিবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। শুরু হয় স্বামীজীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে নানা পত্রপত্রিকায় চিঠিপত্রের ঢল। আশ্চর্যের যে, বিরোধিতা ও

চিঠিপত্রের সংখ্যায় কলকাতা থিওজফিক্যাল আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র মাদ্রাজকেও ছাড়িয়ে যায়। তবে তার কারণ আন্দাজ করা শক্ত নয়—কলকাতার বিবেকানন্দ-বিরোধীরা এই সুযোগটিকে হাতছাড়া করতে চাননি। এই ঘটনার আর একটি দিকও ছিল, থিওজফিক্যাল আন্দোলনের অনুগামী বা সহানুভূতিশীল যেসব মানুষ স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাঁরা সাময়িকভাবে অসুবিধায় পড়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন সেই গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। তার থেকেও বড় কথা—তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম অগ্রণী দৈনিকের সম্পাদক। অতএব তাঁর ভূমিকা অবশ্যই লক্ষণীয়। প্রথমে দেখা যাক স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন চিত্র মিররে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি পেয়েছি ২১ জানুয়ারি ১৮৯৭ : ''গত ১৫ জানুয়ারি স্বামীজী কলম্বো শহরে পদার্পণ করেছেন, সেখানে তাঁকে তুমুল উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনায় বরণ করা নেওয়া হয়েছে।... স্বামীজী মাত্র চারদিন কলম্বোয় কাটিয়ে মাদ্রাজের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সেখানে তাঁর আহ্বানে এক বিশাল উৎসাহ ও ধুমধামপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন প্রস্তুত।... মাদ্রাজে কিছুদিন থেকে তিনি কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করবেন—তাঁর নিজের শহর—ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি এখানে পৌঁছবেন। কথায় আছে, একজন বার্তাবহ পুরুষ নিজের জায়গায় সম্মান পান না; কিন্তু আমাদের ধারণা এক্ষেত্রে এই প্রবাদের অন্যথা হবে, আমাদের এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র হয়ে রাজকীয় অভ্যর্থনায় তাঁকে নিজের শহরে বরণ করে নেবে।''

অতঃপর মিররে স্বামীজীর কলম্বো থেকে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রাপথের উৎসাহপূর্ণ সংবাদাদি প্রকাশিত হয়েছে। তারপর ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত উপরিউক্ত বক্তৃতার ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজীর কলকাতায় পদার্পণের লগ্নে নরেন্দ্রনাথ সেনকে প্রায় মুখ্য ভূমিকা নিতে দেখি।

কিছুটা মাঝারি গোছের প্রতিবাদী পত্র মিররে প্রকাশিত হয়েছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। স্বামীজী কলকাতায় পদার্পণ করেন ঠিক তার আগের দিন। ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখে সেই প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পরিবেশনের সময় নরেন্দ্রনাথ মাদ্রাজের ঘটনাটিকে কিছুটা আড়াল করার প্রয়াস নিয়েছিলেন :

''মতভেদের সময় এখন নয়। আমরা যে-থিওজফিক্যাল সোসাইটির বিনীত সদস্য, সেটির প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের খুব একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নেই। মনে হয় থিওজফি মতাবলম্বী কিছু মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ স্বামীজীর থিওজফিক্যাল পরহিতৈষিতা সম্বন্ধে ধারণার অন্তরায় হয়েছে। এমনকী থিওজফিক্যাল শিবিরে কিছু প্রতিকূল অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। যেহেতু তিনি একজন বাইরের মানুষ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতাকে নিশ্চয় মার্জনা করা যায়।... স্বামী বিবেকানন্দ এখনও অত্যন্ত তরুণ, এবং আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোয় নিঃসন্দেহে তাঁর পছন্দ ও অপছন্দের প্রভূত পরিবর্তন ঘটবে। কিছু কিছু মানুষ এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ইদানীংকার প্রকাশ্য তীব্র নিন্দাগুলিকে আমরা নিশ্চিতভাবেই একজন পরিণত সাধুর চূড়ান্ত বিচার হিসেবে গণ্য করি না।''

এই সু-অভিপ্রায়ী প্রস্তাবনার পরেই মিররের বিচক্ষণ সম্পাদক আশুবিচার্য দিকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লক্ষ করবার বিষয়, কী দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি এইসময়ে ভারতবর্ষের প্রয়োজনে বিবেকানন্দের অপরিহার্যতার দিকটিকেও নির্দেশ করেছিলেন : ''... পাশ্চাত্যে যে-প্রকৃত গৌরবময় কীর্তি তিনি [বিবেকানন্দ] সম্পাদন করেছেন তার প্রতি আমরা মুগ্ধতা প্রকাশে বিরত থাকতে পারি না। অনুপ্রেরণার দিকটি বাদ দিলে, তিনি একথা অবশ্যই বলতে পারেন, 'একাজ আমি একা করেছি!'... তিনি একজন হিন্দু হিসেবে পাশ্চাত্যে গেছেন, এবং সেই

কারণেই তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। শ্রীমতী বেসান্ত একজন ইউরোপীয় মহিলা, তিনি হিন্দু দর্শনের একই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন—কিন্তু তাঁর জ্ঞান পর্যবেক্ষণ-নির্ভর জ্ঞান হিসেবেই বিবেচিত হবে, যেটি বড় জোর অন্যের থেকে পাওয়া।"

তবে নরেন্দ্রনাথের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে সময় লেগেছে। বিভিন্ন কাগজে প্রচুর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, স্বামীজীর সপক্ষে ও বিপক্ষে—দুই-ই। মিররেও এমন বেশ কিছু চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। বিপক্ষ শিবিরের কিছু কিছু চিঠিতে নিন্দাবাক্য বহু সময় তীব্রতায় তীক্ষ্ণ হয়েছে, সৌজন্যের অভাবও যে দেখা যায়নি তাও নয়। এরই পাশাপাশি মিরর অচঞ্চল মনোযোগে স্বামীজীর যাত্রাপথের প্রতি নজর রেখেছে। স্বামীজীর বিশেষ ট্রেন সকাল সাড়ে সাতটায় শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছয়। কলকাতা অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান হিসেবে নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্মানে ট্রেন থেকে নামান। তারপরে স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে মানুষের উচ্ছ্বাস-আনন্দ-আবেগের চিত্র ২১ ফেব্রুয়ারি মিররে বিশদে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজীর কলকাতায় অবস্থান, মাদ্রাজের পূর্ববর্তী সংবাদাদি এবং থিওজফিক্যাল সোসাইটি সংক্রান্ত সংবাদ ও চিঠিপত্র একইসঙ্গে মিররে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে কলকাতায় স্টার থিয়েটারে ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতাসভায় নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিত্ব করেছেন এবং নিজস্ব বক্তব্যের শুরুতেই স্বামীজী সম্বন্ধে এক অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করছেন : "... আমার বিশ্বাস এই কথা একদিন প্রমাণিত হবে যে আধুনিক ভারতবর্ষে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনে, হিন্দু জাতির মধ্যে নবজীবন উজ্জীবনে এবং বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ করতে আজকের সন্ধ্যার বক্তা সর্বশক্তিমানের হাতের যন্ত্রস্বরূপ।" এদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-গভীর কথাগুলি বলেছিলেন, কেন জানি না আজ তা পড়লে মনে হয় সেটির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক দিকটিও প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্ঘাটিত হয়েছিল তাঁর স্বপ্ন ও তীব্র দেশপ্রেমের চিত্রও। অথচ তিনি শুধুমাত্র স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেননি, উভয়ের মধ্যে চিন্তার ফারাকের দিকটিও উল্লেখ করে বলেছিলেন : "সব বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু দেশের পুনরভ্যুত্থানের লক্ষ্যে তাঁর মুখ্য বহু পরিকল্পনার সঙ্গে আমি সহমত। দেশের সর্বোচ্চ লক্ষ্যপূরণের জন্য ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল একজন স্বামী বিবেকানন্দের। তিনি শুধুমাত্র বলা-কথার মানুষ নন, তিনি একজন কাজের মানুষ।" কথা শেষ করার আগে মিররের সম্পাদক নিজের ভাবনার পরিধির আন্দাজও দিয়েছিলেন : "আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর ভূমিকার প্রতি মনোযোগী থেকেছি, আমি তাঁর রচনাদি ও বক্তৃতার অধ্যবসায়ী ছাত্র। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শুধু ভারতবর্ষের মুক্তি নয়, এ-বিশ্বের মুক্তির উপায়ও নিহিত রয়েছে আজকের সন্ধ্যার এই বিশিষ্ট বক্তার প্রচারিত মূল বাণীর মধ্যে—যে-বাণী তাঁর নিজের নয়, সেটি আমাদের সুপ্রাচীন সাধু-মহাপুরুষদের, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত।"

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

১। Surendranath Banerjee, *Making of A Nation* (Humphrey Milford, OUP: London, 1925), p. 193

২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দে নিবেদিত আমার জীবন আমার গবেষণা* (লালমাটি : কলকাতা, ২০১৬), পৃঃ ৪৬৮ (দ্রঃ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা) [*এরপর, আমার জীবন*

আমার গবেষণা]

৩। Pradyot Kumar Ray, *Dewan Ramcomul Sen And His Times* (Modern Book Agency: Kolkata, 1990)

৪। যদিও *Indian National Biography* (Ed. S. P. Sen, Institute of Historical Society, Calcutta, 1974, Vol. 4, p. 112) অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথের হাতে পত্রিকার মালিকানা আসে ১৮৮৩ সালে, আমাদের কাছে বিহারীলাল সরকার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের অন্তিমে (পৃঃ ৭০৫) প্রদত্ত মালিকানা লাভের সময়টিকেই (১৮৮৯) অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

৫। বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (শাস্ত্র-প্রকাশ কার্যালয় : কলিকাতা, ১৩২৯), পৃঃ ৭০৫

৬। *C. Yajnesvara Chintamani* (Thompson & Co.: Madras, 1901), Part 3, p. 191

৭। Aiyar, C. P. Ramaswami, *Annie Besant* (Publications Divisions, Ministry of Information & Broadcasting: New Delhi, 1963), p. 62

৮। His Eastern and Western Disciples, *The Life of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama, Kolkata, 2001), vol. 2, p. 164

৯। P. C. Mozoomdar, *Life and Teaching of Keshub Chunder Sen* (J. W. Thomas, Baptist Mission Press: Calcutta,1887). pp. 132-33

১০। Shivnath Sastri, *Story of the Brahmo Samaj* (R. Chatterjee: Calcutta, 1911), p. 135

১১। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ১৮৫৭ সালে। ১৮৬৬ সালে প্রথম বিভাজন : (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদত্যাগের পর) একদিকে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ; অন্যদিকে কেশব সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় বিভাজন : একদিকে কেশবের নেতৃত্বে নববিধান বা New Dispensation; অন্যদিকে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

১২। Raja Binay Krishna Deb, *The Early History And Growth of Calcutta* (Romesh Chandra Ghose: Calcutta, 1905), pp. 214-15

১৩। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা), খণ্ড ১ (২০০২), পৃঃ ১০৬

১৪। স্বামীজীর *Complete Works*-এর ভূমিকায় নিবেদিতার মূল রচনা : ''Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of 'the Religious ideas of the Hindus', but when he ended, Hinduism had been created.''

১৫। *The Brahmavadin*, November 1911, pp. 535-36

১৬। *আমার জীবন আমার গবেষণা*, পৃঃ ২৬৭ (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা জয় ও সেদিনের দেশি বিদেশি পত্র-পত্রিকা)

১৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ৭, পৃঃ ৪১ [Complete Works-এ মূল ইংরেজি পত্রের এই অংশটি অলভ্য]

১৮। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের ঊষাকাল, *নিবোধত পত্রিকা*, জানুয়ারি ২০১৩, মার্চ ২০১৩, মে ২০১৪।

১৯। Marie Louise Burke, *Swami Vivekananda in the West: New Discoveries* (Advaita Ashrama : Kolkata,), vol. 2 (1994), pp. 83-84

২০। do, 2. 79

২১। *Complete Works of Swami Vivekananda*, 5.31-32